পিতামহ সর্বানন্দ কর্মব্যপদেশে বিক্রমপুর ছেড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন বরিশালে। পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই বৈদ্য-পরিবারের কৌলিক উপাধি ছিল দাশগুপ্ত। জাতিভেদহীন ব্রাহ্মসমাজে এসে সর্বানন্দ হলেন দাশগুপ্তের বদলে শুধুমাত্র দাশ। সেই থেকে বরিশালের সর্বানন্দভবনের এই বিশিষ্ট পরিবারটি 'দাশ পরিবার' নামে বিখ্যাত হল। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। তাঁরই প্রথম পুত্র কবি জীবনানন্দ। জীবনানন্দের শিক্ষাব্রতী পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য। মাতামহ ছিলেন কবি। মাতা কুসুমকুমারীও। তাঁর

ছোটনদী দিনরাত বহে কুলকুল
পরপারে আমগাছে থাকে বুলবুল—

অথবা

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে;

—প্রভৃতি মাতৃরচিত কবিতা ছিল শিশু জীবনানন্দের অস্ফুট কণ্ঠের প্রথম কলকাকলি। কবির অনুজা শ্রীমতী সুচরিতা দাশ লিখছেন,

'বাবা যদি দিয়ে থাকেন তাঁকে সৌরতেজ— প্রাণবহ্নি, মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন স্নেহমমতার বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা'।

কবিধাত্রী বরিশালের প্রকৃতিও জীবনানন্দের কবিমানসকে বিস্ময়রাগে রঞ্জিত করেছে।

'আকাশে অনাদি অনন্ত ইন্দ্রনীল আর ধরণীর দিগন্ত ছুঁয়ে আস্তীর্ণ শ্যামলতা নয়ন-মন মগ্ন করে রেখেছে, চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সলজ্জ-শিখা ভালো-লাগার দীপ, যাই-না-কেন দুচোখ ভরে দেখো, বিস্ময়ে বিদীর্ণ হয়ে যাও, সবকিছুকে ভালো-লাগা ভালোবাসার আনন্দে থরথর করে কাঁপো—এমনি মোহমেদুরতা সে দীপের আলোয়। অস্ফুট শৈশব থেকে প্রাণময় কৈশোর ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে বরিশালে—এমনি করে।' [শ্রীমতী সুচরিতা দাশ]

সর্বানন্দভবনের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে। রূপকথার মতোই তা রোমাঞ্চকর। শ্রীমতী সুচরিতা লিখছেন,

'সেই এক গল্প ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পর্কে, যাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একজনকে নাকি পরীতে পেয়েছিল। জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেত পরীরা, ভোরের আলোয় তাঁকে পাওয়া যেত শিশিরঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে। তাঁর বিছানায় ছড়ানো থাকতো কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। তারপর বহুযুগ পার হয়ে গেছে। এঁদেরই উত্তরপুরুষ জীবনানন্দ।'

এই আশ্চর্য কিংবদন্তিটি জীবনানন্দের কবিমানস সম্পর্কে একটি নিগূঢ় সংকেত বহন করছে। জীবনানন্দও পরীতে পাওয়া কবি। সৌন্দর্যতনু প্রেমের পরীরা তাঁকে জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত এক অতীন্দ্রিয় রহস্যালোকে। অবোধপূর্ব সেই রহস্যজগতের উপলব্ধির কথাই তিনি বলেছেন তাঁর মরমিয়া আলো-আঁধারি ভাষায়।

জীবনানন্দের কবিজীবন সম্পর্কে আরো কয়েকটি অপরিহার্য ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 'ময়ূখ'-এর জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যায় [শীত-গ্রীষ্ম ১৩৬১], কবির অনুজ অশোকানন্দ ও সুচরিতা-রচিত স্মৃতিকথায়। সর্বানন্দভবনের কাব্যিক পরিবেশ সম্পর্কে সুচরিতা লিখছেন:

'প্রাঙ্গণে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে মখমলের মত সবুজ ঘাস। তার উপরে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম পাপড়ির সুচারু আল্পনা আঁকা। সূর্যের জাফরানি আলোর রঙে লতাপাতা পাখপাখালির

সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকে। জানালার সামনে দুটো গন্ধরাজ গাছ আগাগোড়া সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে, পাতা দেখা যায় না। পাতার আড়াল থেকে উঁকি দেয় নীলজবা। মাধবীগুচ্ছে রক্তরাগ। কাঁঠালিচাঁপার তীব্র মধুর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।'

অশোকানন্দ বয়সে কবির তিনবছরের ছোট—তাঁর বাল্য কৈশোর ও যৌবনের নিত্য-সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। শিশুকবির সুকুমার স্পর্শকাতর মনটির পরিচয়বাহী কয়েকটি কাহিনী তিনিও তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বানন্দভবনের বাগানে কাজ করত এক ফকির। দীনতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি ছিল সে। স্ফটিক-জলের মতো ছিল তার দুটি চোখ। যখন ফকিরের অন্য কোনো কাজ থাকত না তখন কবিপিতা সত্যানন্দ বলতেন, 'বর্ষায় ঘাস বড্ড বড়ো হয়েছে, সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, তুমি এই ঘাস পরিষ্কার কর।' ঘাসের ওপর কাস্তে চালালে শিশু-কবি কিন্তু অত্যন্ত কাতর হতেন। যে নবীন ঘাস জন্মাবে সেই কচি ঘাসশিশুদের স্বপ্ন দেখিয়ে ফকির কবিকে প্রবোধ দিয়ে বলত, 'কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েক দিনের মধ্যেই আবার খুব সুন্দর নরম কচি ঘাস হবে।'

এই কাহিনীটি পড়ার পর স্বভাবতই জীবনানন্দের 'ঘাস' কবিতাটির কথা মনে পড়বে :

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
    পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
    হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
    গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
    ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
    শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

বলাই বাহুল্য, অশোকানন্দের কাহিনীতে যে চেতনার উন্মেষ তারই পরিশীলিত কাব্যরূপ হল এই কবিতাটি । এই সূক্ষ্ম সুকুমার প্রকৃতিপ্রেম কবিপ্রকৃতির একটি অনন্যপরতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

পরিচিত পরিবেশ থেকে সমাহৃত অভিজ্ঞতার উপকরণ কীভাবে জীবনানন্দের কবিকল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে শ্রীমতী সুচরিতার আরেকটি গল্প থেকে :

'সেদিন আকাশময় সোনালি রঙের ভিজে ভিজে রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে, হালকা হাওয়া দিচ্ছে রেশমের রোমাঞ্চময় স্পর্শের মতো। ইজিচেয়ারে বসে দাদা লিখছেন। প্রগাঢ় তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছের হাজার রক্তিম পুষ্পস্তবক, লাল আগুনে জ্বলছে, গাছের তলার সজল মাটিতে অশেষ সবুজ ঘাসের তরতরে প্রাণস্পন্দনের মখমল, তার ওপর আলো আঁধারের সচল ছায়াছবির নিপুণ আল্পনা। এই তো লিখছিলেন, কখন যেন আনমনা হয়ে গেছেন রৌদ্রছায়ার সেই ছন্দোভঙ্গি দেখে ঘাসের নিবিড়ে ঘাসফড়িংয়ের নৃত্যপরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়ে। একটা বিড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে, আসছে-যাচ্ছে অন্ধকারের মতো নরম পায়ে লাফালাফি করছে, আলোছায়ার চঞ্চলতার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনো বা কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়েই

নখের জোর পরীক্ষা করে নিচ্ছে। রোদের সঙ্গে, প্রকৃতির নগ্ন হৃদয়ের সঙ্গে এই কলহ দেখে কেমন যেন কৌতুক বোধ করছিলেন দাদা, কিংবা ব্যথিতই হয়েছিলেন। কবিতা লিখলেন।

সেই কবিতারই নাম 'বিড়াল'। কবিতাটির আরম্ভ শ্রীমতী দাশ-বর্ণিত প্রাকৃত বিড়ালটিকেই নিয়ে। গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে, সারাদিন ওই বিড়ালটির সঙ্গে বারবার কবির দেখা হচ্ছে। কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে। বাক্যটির বক্তব্য অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু বলার ভঙ্গিটি বিশুদ্ধ জীবনানন্দীয়। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর একাত্ম নিমগ্নতা থেকেই কবি এই বাগ্‌ভঙ্গির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে জীবনানন্দের কবিকৃতি ও কলাকৃতির রাখীবন্ধন হয়েছে। কবি বলছেন :

> হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
> শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
> তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
> সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

এখানে প্রাকৃত বিড়ালটি আর বিড়াল নেই, সে কবির একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত জগৎ মিলিয়ে গেছে কবির সেই উপলব্ধির জগতে। রচিত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র জগৎ। সেই জগতে বিড়ালটি বিশুদ্ধ বিড়াল হয়েও একটি বিশুদ্ধ প্রতীক। আর সেই প্রতীক কবির একটি বিশেষ উপলব্ধির বাহন হয়ে এমন একটি ভাবময় সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে যার আনুরূপ্য বিশ্বভুবনে কোথাও নেই, আছে কেবল কবিপ্রজাপতির অলৌকিক মায়ার জগতে। প্রকৃতিকে নিয়ে জীবনানন্দের এই দ্বিতীয় বিশ্বরচনাই তাঁর প্রতিভার অভিনব শিল্পকৃতি।

৩

জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বরিশাল স্কুলে আর কলেজে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ে কলকাতায় আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে সাম্মানিক ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন পরে কলেজ থেকে তাঁর চাকরি যায়। তারপর কিছুদিন দিল্লিতে এক কলেজে কাজ করে জীবনানন্দ আবার ফিরে গিয়েছিলেন বরিশালে। সেখানকার ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক হয়ে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। দেশবিভাগের পরে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। জীবনের বাকি দিনগুলি মুখ্যত কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়। ১৯৫৪ সালে দৈবদুর্ঘটনায় মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে, তখন তিনি ছিলেন হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে তাঁর সহযাত্রী কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,

'প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কোনো কবি নেই ; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ।' [কালের পুতুল, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪৭]।

বুদ্ধদেব জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আলোচনা-প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করেছিলেন। বরিশালের জীবনানন্দ সম্পর্কে এই মন্তব্য অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। কিন্তু কলকাতার জীবনানন্দ সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য নয়। আসলে মহানগরীর জীবন ও মনন জীবনানন্দের কবিকল্পনাকে নবরূপ দান করেছিল। তাই তাঁর কাব্যসাধনাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, বরিশালের প্রকৃতি-প্রভাবিত প্রথম যুগ ; দুই, কলকাতার নাগরিকতা-প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ। প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থ হল 'ঝরা পালক' (প্রকাশ ১৩৩৪। ১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (প্রকাশ ১৩৪৩। ১৯৩৬), 'রূপসী বাংলা' (রচনাকাল ১৩৪৩-৪৪), 'বনলতা সেন' (রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬), এবং 'মহাপৃথিবী' (রচনাকাল ১৩৩৬-৪৮)। দ্বিতীয় যুগের ফসল সংকলিত হয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' (রচনাকাল ১৩৩৫-৫০), এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' (রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০) ও পরবর্তী রচনাবলীতে। কলকাতাপ্রবাস জীবনানন্দের প্রকৃতিনিষ্ঠ কাব্যসাধনা থেকে তাঁকে সরিয়ে এনেছে। সমকালীন যুগজীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটি সম্পর্কে তিনি অধিকতর সচেতন হয়েছেন। কাব্যকে তিনি বলেছেন, 'কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাপ্রতিভার সন্তান।' নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর কবিভাষারও পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর প্রথম যুগের কবিভাষা ছিল হৃদয়াবেগপ্রধান, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষা মননাবেগপ্রধান। প্রথম যুগের কবিভাষায় ছিল বিষণ্ণচিত্তের বিস্ময়াবেগ, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষায় দেখা দিয়েছে বিক্ষুব্ধ চিত্তের শ্লেষবক্রোক্তি।

৪

জীবনানন্দের কাব্য ও কবিমানসের বিশ্লেষণে বুদ্ধদেবের উক্তিটিকে পুনর্বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বলেছেন, জীবনানন্দ সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই বিশেষ অর্থে জীবনানন্দই একমাত্র প্রকৃতির কবি। আমরা বলেছি, জীবনানন্দের প্রথম ভাগের কবিতা সম্পর্কে উক্তিটি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের উক্তি এবং আমাদের স্বীকৃতির ফলে জীবনানন্দের কবিমানস ও কবিধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি, —এই অর্থে যে প্রকৃতিই তাঁর সমস্ত উপলব্ধির রূপক।

আসলে কিন্তু জীবনানন্দ প্রেমের কবি। প্রেমের কবি না বলে বরং প্রেমের মিস্টিক বললেই তাঁর কবিসত্তাকে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারা যাবে। তাঁর সমস্ত চেতনার মর্মমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। কবির এই প্রেমচেতনা কোনো ব্যক্তিপ্রেমের 'বিশ্লেষধিয়ার্তি'র উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা তা কবিমানসের 'জননান্তরসৌহৃদানি'র সংস্কারমাত্রও হতে পারে। কবিমানসের এই বিপ্রলম্ভ-প্রেমচেতনাই কবিকে বিশ্বমুখী করেছে। সংস্কৃত কবি বলেছেন, মিলনের চেয়ে বিরহই বরং ভালো, কেননা, মিলনে প্রিয়াই বিশ্বকে আড়াল করে একেশ্বরী হয়ে বিরাজমান থাকেন— কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হয়ে যায়। 'সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।' জীবনানন্দের ত্রিভুবনও তাঁর প্রেমচেতনায় তন্ময়ীভূত হয়েছিল।

আমরা বলেছি, জীবনানন্দ পরীতে-পাওয়া কবি। কথাটা এই অর্থে সত্য যে, জীবনানন্দের প্রেমচেতনা এক অতীন্দ্রিয় ভাবাবেশে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর এই ভাবাবেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', —নয়নমনের সেই অনধিগম্য লোকে রয়েছে তাঁর চিরপলাতকা মানসসুন্দরী। ভাষার অতীত তীর থেকে

কবি তাঁর মরমী চেতনাকে ভাষার তীরে পৌঁছে দেবার ক্লান্তিহীন চেষ্টা করেছেন সারাজীবন। এই দুঃসাধ্য চেষ্টায় তিনি যতটা সফল হয়েছেন ততটাই কবি হিসেবে তাঁর সফলতা। তাঁর কবিজীবনের এই অনন্যপরতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলেই তাঁর ব্যর্থতা ও সার্থকতার যথার্থ বিচার সম্ভব হবে।

ইন্দ্রিয়বোধাতীত এক রহস্যময় প্রেমাবেশের ভিতর দিয়ে কেটেছে তাঁর সারা জীবন। এই প্রেমের আবেশেই কবি তাঁর পলাতকা প্রিয়াকে দেখেছেন আকাশভুবনের অপরূপ রূপের জগতে। এই অর্থেই জীবনানন্দ প্রেমের কবি, এই অর্থেই তিনি প্রকৃতির কবি।

কবির প্রথম কাব্যসংকলনের নাম 'ঝরা পালক'। তার 'কবি' শীর্ষক কবিতাটিতে রয়েছে কবিরই আত্মকথা। কবি বলেছেন :

আমি নিদালির আঁখি,— নেশাখোর চোখের স্বপন !
নিরালায় সুর সাধি, —বাঁধি মোর মনসীর বেণী,
মনুষ দেখে নি মোরে কোনোদিন, আমারে চেনে নি!
... ...
শুক্লা একাদশী-রাতে বিধবার বিছানায় যেই জ্যোৎস্না ভাসে
তারি বুকে চুপে- চুপে কবি আসে, —সুর তার আসে!
... ...
জানে না তো কি যে চায়, —কবে হায় কি গেছে হারায়ে!
চোখ বুজে খোঁজে একা, —হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে
... ...
তারি লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা, —হিম চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি' বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা !

বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা কবিমানসের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু শুধু ছায়া-পুত্তলিকাই নয়, একটি স্বপ্নকামনাও রয়েছে তার অনুষঙ্গ হিসাবে। 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতায় বলেছেন :

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, —রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাওনের মেঘ, —আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙীন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে —কতদিন!

বলাই বাহুল্য, এই রাজার দুলাল কবিরই কল্পনাসত্তা। ঘুমপথে, স্বপ্নে বহুদিন যাকে কবি দেখেছেন সেই পলাতকা প্রিয়া মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদে কবিকে দেখা দেয়। তাই কবি ভালোবাসেন অস্ত-চাঁদকে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের হেতু 'অস্তচাঁদে' কবিতায় বিধৃত হয়েছে :

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ, —ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী।
—অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালোনদী, —ঢেউয়ের কলসী,
নিঝ্ঝুম বিছানার 'পরে
মেঘবৌ'র খোঁপাখসা জ্যোৎস্নাফুল চুপে চুপে ঝরে,—
চেয়ে থাকি চোখ তুলে, —যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদ সচকিতে উঠে শিহরিয়া।

সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে
মাঠে ঘাটে একা একা, —বুনোহাঁস —জোনাকির ভিড়ে।
দুশ্চর দেউলে কোন্ —কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর —বাবিলোন্ —মিশরের মরুভূ-সংকটে,
কোথা পিরামিড-তলে, —ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,
কোন্ মন-ভুলানিয়া পথ-চাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না, —চার চোখে —অলসনয়নে।

'ঝরা পালক'-এর এই দীর্ঘ তিনটি উদ্ধৃতি থেকে কবির মন আর কবির স্বপ্নলোকের সঙ্গে পাঠকের যে পরিচয় ঘটে, কবির সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনায় সেই পরিচয়ই স্পষ্টতর ও নিবিড়তর হয়ে দেখা দেবে। 'ঝরা পালক'-এর কবি তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিকে খুঁজে পান নি ; তখনো তাঁর কবিভাষা পূর্বসূরি আর সমকালীন সহযাত্রীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু 'ঝরা পালক' নামের মধ্যেই তাঁর স্পর্শকাতর সুকুমার কবিমানসের বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে। কবি বলেছেন :

আমি কবি,— সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি !

শুধু ঝরা পালকের ছবিই নয়, এই কবিতার শেষ স্তবকে আছে— 'পড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখীর নষ্ট নীড়।' এই পাখি —নীড়হারা পাখি জীবনানন্দের কাব্যলোকে একটি বিশেষ প্রতীকদ্যোতকতা লাভ করেছে। মনে হয় ধীরে ধীরে এই পাখি যেন তাঁর আত্মার দোসর হয়ে উঠেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অনেক আকাশ' কবিতায় দেখি পাখির রূপক একাধিকবার ব্যবহৃত:

সে এসে পাখির মতো স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়,—
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর —অস্থিরতা !

কিংবা

সবাই এসেছে পথে, —আসে নাই তবু সেই পাখি।—
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপ্নের 'পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি !

শেষ পংক্তিতে পাখির জগৎ আর মানুষের জগতের ব্যবধান ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' এবং 'মহাপৃথিবী'র 'হায় চিল', 'সিন্ধুসারস' এবং 'বুনো হাঁস'-এর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়বে।

বসন্তের রাতে কবির চোখে ঘুম নেই, কোন্‌দিক থেকে যেন সমুদ্রের স্বর ভেসে আসে, তখন কবির মনে হয়,

আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর ।
তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে ।

চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া পাখির ডানার ঘ্রাণ কবির কাছে সুগভীর অর্থবহ। কবি তলিয়ে যান জীবনবোধের অতলে। বলেন,

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ —গভীর —গভীর।

পাখির জগতে ডুব দিয়ে জীবনের এই গভীর স্বাদ বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের রচনাতেই বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। ইংরেজি কাব্যের রোমান্টিক যুগে স্কাইলার্ক আর নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে যে-সব আশ্চর্য কবিতা লেখা হয়েছে জীবনানন্দের কবিতাগুলি তাদেরই সমপর্যায়ের। শেলির যেমন স্কাইলার্ক, জীবনানন্দের তেমনি সিন্ধুসারস। 'মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায়' সিন্ধুসারসের সহযাত্রী কবি দেখেছেন,

নাচিতেছে টারান্টেলা —রহস্যের ; ...
চেয়ে দেখি বরফের মতো সাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

সিন্ধুসারস শুধু আনন্দেরই বার্তাবহ। কেননা সে স্বপ্ন দেখতে জানে না। সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেলে জীবনের মর্মমূলে যে বেদনার জন্ম হয় তার সন্ধান সে রাখে না :

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো —পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার —ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো নিভে গেছে ;
... ...
তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনোনাকো, অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানোনাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
... ... ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন ।

প্রেম আর সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনাই জীবনানন্দকে কবি করেছে। সিন্ধুসারসকে লক্ষ্য করে কবি তাঁর সেই মর্মলোকের বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন । 'বুনো হাঁস' কবিতায় বলেছেন, জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে বুনো হাঁস উড়ে যায়। রাত্রির কিনারা দিয়ে তাদের ক্ষিপ্র ডানা নিঃসীম শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তারা যায়। তারপর নক্ষত্রের বিশাল আকাশে দু-একটা কল্পনার হাঁস কবিচেতনায় নিমগ্ন হয়ে থাকে। কবি বলেন :

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ।

কবির হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতরে পাখির ডাক যে পলাতকা প্রেমের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয় তারই অনবদ্য কাব্যরূপ হল 'হায় চিল' কবিতাটি। আট পংক্তির এই ছোট্ট কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দের কবিকল্পনার মূলকেন্দ্রটি ধরা পড়েছে—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে

তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে- উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে ।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে,
পৃথিবীর রাঙা-রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থে এই কবিতাটির সঙ্গে ইয়েটসের 'He Reproves the Curlew' কবিতার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতাটি নিশ্চয়ই ইয়েটসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু জীবনানন্দের অনুপ্রেরণা তাঁর স্বকীয় অনুভূতিতে জারিত হয়ে একেবারে তাঁর নিজেরই মৌলিক রচনা হয়ে উঠেছে।

৫

'ঝরা পালক' জীবনানন্দের কাব্যসাধনার ইতিহাসে প্রস্তুতি-পর্ব। কবি স্বমহিমায় প্রকাশিত হলেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যসংকলন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। এই অদ্ভুত নামকরণের যথার্থ তাৎপর্য আবিষ্কার করা কঠিন। কবির প্রসিদ্ধতম কবিতা 'বনলতা সেন'-এর শেষ স্তবকে তার একটি ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;

শেষের বাক্যটির অন্বয় এবং বাচ্যার্থ দুরূহ। আসলে ওই শেষ দুটি পংক্তি 'বনলতা সেন' কবিতার দুর্বল গ্রন্থি। কিন্তু ওর মধ্যেই যে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা আছে তাতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামকরণের আভাস রয়েছে। পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে জোনাকির ঝিলমিল রঙে পাণ্ডুলিপির গল্প শুরু হয়। আমরা জানি বরিশালের আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনানন্দের মন গড়ে উঠেছে। নিসর্গসৌন্দর্য তাঁর কাব্যে নতুন সৌন্দর্যও পেয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যলোক এক অস্পষ্ট-ধূসর স্বপ্নের মায়া দিয়ে গড়া। রূপময় বিশ্বের সব রং নিভে যাবার পর তাঁর স্বপ্নমদির রসলোকের দ্বার অর্গলমুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ প্রেমচেতনা প্রকৃতিচেতনা ও ইতিহাসচেতনার কবি। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিচেতনা ও ইতিহাসচেতনার মর্মমূলে রয়েছে তাঁর প্রেমচেতনা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি মুখ্যত প্রেমের কবি। কাব্যের একটি কবিতার নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'। এ স্বাক্ষর প্রেমিকের। কবি বলেছেন :

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে ।
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে ! —সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা —আকাশেও নাই তার স্থল,
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল ;
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই ; কোনো এক মানুষীর মনে

কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

'সে এক বিস্ময়, পৃথিবীতে নাই তাহা।' কবির চোখে এই অপার্থিব বিস্ময়েরই নাম প্রেম। 'পৃথিবীতে নাই তাহা' —একথার অর্থ হল রূপময় বিশ্বে তাকে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হয় প্রাণময় বিশ্বে। তাই তা অপার্থিব। অথচ এই অপার্থিব প্রেমের জন্যই পৃথিবীর জীবন অর্থময়। 'প্রেম' কবিতায় কবি বলেছেন :

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম, —গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব'লে।

এই স্বীকৃতি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবনানন্দের কবিমানসে প্রেমই মুখ্য প্রেরণা। আমরা বলেছি, তাঁর সমস্ত চেতনার মর্মমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। বলেছি, কবির এই চেতনা কোনো ব্যক্তি-প্রেমের বিশ্লেষধিয়ার্তির উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা তা কবিমানসের জন্মান্তরসৌহৃদানির সংস্কারমাত্রও হতে পারে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেমের কবিতাগুলি পড়ে কিন্তু পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এগুলি কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই সন্তান। '১৩৩৩' কবিতাটি আমাদের অনুমানকে অনিবার্য সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কবিতাটিকে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রারম্ভেই কবি বলেছেন,—

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ; —তারপর, —মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা, —হয়েছে মলিন
চক্ষু এই ; —ছিঁড়ে গেছি, —ফেঁড়ে গেছি, —পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!

তারপরে দ্বিতীয় স্তবকের আরম্ভে বলা হয়েছে,

আমারে চাও না তুমি আজ আর, —জানি;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ! তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছ কাহারে।
কে বা সেই।

এই একান্ত ব্যক্তিগত বেদনাগর্ভ জিজ্ঞাসাই সাধারণীকৃত হয়েছে 'প্রেম' কবিতায় :

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা।
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—একরাত ;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
সবাই চলিয়া যায়, —সকলেরে যেতে হয় ব'লে
তাহারও ফুরাল রাত।

এই নশ্বর মর্ত্যজীবনে সবই নশ্বর, প্রেমও নশ্বর, তাই প্রেমকেও চলে যেতে হয়। এই অনিবার্য জীবনসত্যকে কবি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কবির বেদনাবিদ্ধ মন নিজের যন্ত্রণাকে ভাষা দেবার জন্যে একটি রূপকের আশ্রয় নিয়েছে। শিকারের রূপক। 'ক্যাম্পে' কবিতাটি তারই কাব্যরূপ। হরিণশিকার এর বিষয়ালম্বন। বসন্তের রাতে চারিপাশে বনের বিস্ময়। চৈত্রের বাতাস যেন জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ। এই মায়ামদির অরণ্যপরিবেশে এক ঘাইহরিণী সারারাত ডাকছে পুরুষ হরিণকে। একে একে হরিণেরা গভীর বনের পথ ছেড়ে সেই ডাকে ছুটে আসছে, আর শিকারীর অব্যর্থ গুলিতে দিচ্ছে নিজেদের প্রাণ। কবি বলছেন :

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তাকে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।

কিন্তু ক্যাম্পের এই শিকারকাহিনী অনিবার্যভাবেই কবির বুকের দুঃসহ যন্ত্রণার রক্তাক্ত ক্ষতস্থানকে স্পর্শ করেছে। খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ নিয়ে বিষণ্ণ চেতনায় কবি বলেছেন :

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি ?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মতো ?
আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
... ...
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে ?
আমার বুকের প্রেম এই মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে ?

এই কবিতায় কবি যে যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের আর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে নি। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কিন্তু যন্ত্রণা যত বড়োই হোক, বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করার শক্তিই কবিত্বশক্তি। এই অর্থে সার্থক কবিমাত্রেই নীলকণ্ঠ। প্রেমে দুঃখ আছে, কিন্তু প্রেমই জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি। তাই কবি বলছেন :

ওগো প্রেম,—বাতাসের মতো যেই দিকে যাও চ'লে,
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন !
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হ'লে !
তুমি যদি বেঁচে থাকো, —জেগে রবো আমি এই পৃথিবীর 'পর,—
যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর !

কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনা কেন ওতপ্রোত হয়ে আছে উপরের উদ্ধৃতি থেকে তার হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রিয়ার কাছে 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর কবির জিজ্ঞাসা ছিল :

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার ?

বিরহী চিত্তের এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই কবির চেতনা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। নিজের অকুণ্ঠ অনুরক্তির প্রতিশ্রুতিও সেখানে রয়েছে। তাই 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর ধ্রুবপদ হল :

তুমি তা জানো না কিছু— না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে ;

এই প্রতিদানপ্রত্যাশাহীন প্রেমচেতনাতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিচিত্ত আবিষ্ট হয়ে আছে। তাই তিনি আত্মজিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে তাঁর প্রেমের সত্যকেই ভাষা দিয়ে বলেছেন,

একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা !

এই ভালোবাসাকে ভালোবাসাই জীবনানন্দের সকল কাব্য-কবিতার অঙ্গিরস। ব্যর্থপ্রেম তাঁর ব্যথিত চিত্তে বিশ্বাসের আলো নিভিয়ে দেয় নি। বরং তা তাঁর কবিদৃষ্টির মণিদীপ হয়ে বিশ্বভুবনকে এক অপরূপ গোধূলিধূসর সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছে।

৬

জীবনানন্দ প্রকৃতিলালিত কবি। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-র ঐতিহ্যে বাংলার দুজন মহৎ শিল্পীর জন্ম হয়েছে। একজন 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ, আরেকজন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি-মহাপৃথিবী'র জীবনানন্দ।

আমরা বলেছি, জীবনানন্দের কাব্যকবিতার অঙ্গিরস হল প্রেমের রসরূপ। তাঁর প্রকৃতিকবিতাও এই প্রেমের রসে জারিত। চোখে প্রেমের মায়াঞ্জন পরেই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি বাংলার প্রকৃতিকে দেখেছেন। সে দেখার মধ্যে এমন একটা কোমল মধুর স্পর্শ আছে যে, অতি তুচ্ছ নগণ্য বস্তুও অসামান্য মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায় জীবনকে তিনি কত গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। জীবনানন্দ মানুষকে ভালোবেসেই পেয়েছিলেন প্রকৃতিকে। প্রকৃতির বুকেই তাঁর প্রেমের— তাঁর প্রেমজ বেদনার মুক্তি। তাই নিঃসীম আকাশের নীলিমায় জীবনের সব ধূসরতা লীন হয়ে তাঁর চেতনাকে 'আকাশের—আকাশে আকাশে' সম্প্রসারিত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে 'ঝরা পালক'-এর 'নীলিমা' কবিতাটি মনে পড়বে। বিশেষ করে ওই কবিতার শেষ স্তবক। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান' কবিতার নিম্নধৃত পংক্তিত্রয়েও একই কথা কবি বলেছেন :

শহর—বন্দর—বস্তি—কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে ;
শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।

সত্যই প্রকৃতি জীবনানন্দের ক্লান্ত ব্যথিত চিত্তকে শুশ্রূষার গান শুনিয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কবির এক নিবিড় একাত্মতা গড়ে উঠেছিল। এক রহস্যময় হৃদয়-সম্পর্ক। 'মাঠের গল্প' তাই তাঁর কাছে নিজেরই জীবনের গল্প হয়ে উঠেছে। মেঠো চাঁদ

'বনলতা সেন'-এই জীবনানন্দ দাশ মাধ্যন্দিন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠলেন। বনের হীরামন নয়, অকূল সমুদ্রে সন্তরণক্লান্ত প্রাণই তাঁর কবিচিত্তের সার্থক উপমান হয়ে উঠল :

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

তাছাড়া 'বনলতা সেন'-এ প্রমাণিত হল যে, জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র কবি হয়েও 'মহাপৃথিবী'র কবি। তাই 'বনলতা সেন' আর 'মহাপৃথিবী'তে — জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিকল্পনার তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছেন।

কোনো একটি কবিতা দিয়ে জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কবিসত্তাটিকে যদি চিনতে হয় তাহলে সে কবিতার নাম 'বনলতা সেন'। তিনটি স্তবক দিয়ে গড়া এই কবিতার মধ্যে কবির স্বপ্নবৃত্তটি পূর্ণ হয়েছে। কবি বলছেন :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন ।

অতীতচারিতা রোমান্টিক কবিমানসের ধর্ম। কিন্তু এখানে শুধু অতীতচারিতাই নয়, পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে ইতিহাস-পরিক্রমায় খণ্ডদেশকাল পেরিয়ে কবি মহাকালের মহাপৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। নিখিল ইতিহাসে কবির সেই মহাজীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে একটি প্রেমের স্বপ্ন, একটি প্রেমের আকর্ষণ। সেই প্রেমেরই স্বপ্নবিগ্রহ নাটোরের বনলতা সেন। জীবনের সফেন সমুদ্রে ক্লান্ত প্রাণের কাছে বনলতা সেন বহন করে এনেছে দ্বীপের ভরসা— সবুজ ঘাসের দেশের আশ্রয়।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ;

বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখে পরম আশ্রয়, পরম আশ্বাসভরা যে প্রেমের সাক্ষাৎ কবি পেয়েছেন তার মধ্যেই রয়েছে কবিজীবনের পরম প্রাপ্তি। তারই স্বীকৃতি দিয়ে কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
... ...
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৯

বনলতা সেন কিন্তু কোন বিশেষ নারী নয়। সে নিখিল নারীসত্তার নামরূপমাত্র। কবি নানা নামে সেই একই রহস্যময়ী নারীসত্তাকে বার বার ডেকেছেন। 'চোখে যার শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার' সেই শঙ্খমালা, 'পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন যার শরীর' সেই সুদর্শনা, 'পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতন যে' সেই সুরঞ্জনা, 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে যে এক দূরতর দ্বীপ' সেই সুচেতনা, —নানা নামে সেই একই প্রেমময়ী নারীকে কবি সম্বোধন করেছেন।

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় কবি এমন এক নারীর কথা বলেছেন যে-নারী কবিকে চিরদিন ভালোবেসেছে, অথচ তার মুখ কবি কোনোদিন দেখেন নি। কবির ইতিহাসচেতনা যে তাঁর প্রেমচেতনারই সহোদর এই কবিতায় তারই প্রমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবির হৃদয়ে এক বিলুপ্ত নগরীর স্মৃতি ভেসে ওঠে। সে নগরী ভারত-সমুদ্রের তীরে, কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে, অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে ছিল। অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল, মেহগিনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক। সেই অপরূপ-সুন্দর বিলুপ্ত নগরীর মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদে ছিল কবির বিলুপ্ত হৃদয়, তাঁর মৃত চোখ, আর তাঁর বিলীন স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। আর ছিল সেই নারী যে কবিকে চিরদিন ভালোবেসেছে। কবি বলছেন :

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

ইতিহাসচেতনায় নিমগ্ন হয়ে কবি সৌন্দর্য, মাদকতা ও প্রেমের তিনটি প্রতীক আবিষ্কার করেছেন,— ১. 'পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' ; ২ 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ', আর ৩. 'নগ্ন নির্জন হাত'। এই তিনটি প্রতীক জীবনানন্দের সামগ্রিক জীবনচেতনারই তিনটি দিকের সংকেত বহন করছে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের হরগৌরী সম্পর্ক। এবং একথা তো শিল্পিমাত্রেরই মর্মকথা যে, প্রেমের দৃষ্টিতেই বিশ্বভুবন সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে মাদকতার মিশ্রণে যে অপূর্ব বস্তু গড়ে ওঠে তারই পরিচয় পাওয়া যাবে জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত' কবিতায়। গভীর হাওয়ার রাতে কবির মশারিটা কখনো ফুলে উঠেছে 'মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো', কখনো তাঁর মনে হয়েছে মাথার ওপরে মশারি আর নেই, 'স্বাতী নক্ষত্রের কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে।'

এই হাওয়ার রাতে আকাশের অসীম নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়েছে, 'অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা।' বিশাল আকাশ জ্বলজ্বল করছিল 'জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো'। তাঁর জানালা দিয়ে শাঁই শাঁই করে আকাশের বুক থেকে নেমে এসেছিল উত্তুঙ্গ বাতাস 'সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।'

এই প্রমত্ত হাওয়ার রাতে কবির হৃদয় ভরে উঠেছিল 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।' সেই মত্ততাকে ভাষা দিয়ে তিনি বলছেন,

> হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
> দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
> মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
> রোমশ উচ্ছ্বাসে।

'বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণ' এবং 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো' অন্ধকারের 'চঞ্চল' 'বিরাট' 'সজীব' 'রোমশ' উচ্ছ্বাস বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিকল্পনাতেই সম্ভব হয়েছে।

এই মাদক প্রমত্ততা জীবনানন্দের বলীয়ান জীবনরস-রসিকতারই পরিচায়ক। জীবনরসিক কবি শুধু নিজের ভোগের কথাই চিন্তা করেন নি, মানুষের ভোগে নিজেকে উৎসর্গ করতেও চেয়েছেন। এই আত্মোৎসর্জনস্পৃহা 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'কমলালেবু' কবিতায় আশ্চর্য কাব্যরূপ পেয়েছে :

> একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
> আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে ?
> আবার যেন ফিরে আসি
> কোনো এক শীতের রাতে
> একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংসে নিয়ে
> কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে ।

কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে কমলালেবুর 'করুণ মাংস' হয়ে নিজেকে নিবেদন করার কল্পনা সেবাময় মানবপ্রেমের পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের পরে

নতুন কবিভাষার আবিষ্কর্তা হলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি আমাদের ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে আমাদের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিকে নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত করেছেন।

ভাষাসৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যই প্রথমে লক্ষ করবার মতো। এই বিশ্বভুবনকে—এই নিসর্গলোকের রূপ-রং-শব্দ-গন্ধকে তিনি নিজের ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে নিজের মতো করে অনুভব করেছেন। তার ফলে আমাদের এই চিরপরিচিত জগৎ প্রথমে কবির একান্ত নিজস্ব একটি মনোজগতে রূপান্তরিত হয়ে, তাঁর কলাকৃতিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়ে, আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। বাংলার সৌন্দর্যালংকৃত কবিভাষার সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের পরে মধুসূদনের কৃতিত্ব অসাধারণ। তারপর রবীন্দ্রনাথের হাতে সে ভাষা রূপের জগৎ ও সুরের জগতে নব-নব বর্ণবৈভব ও ধ্বনিমাধুর্যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে, রবীন্দ্রনাথের বাণীবিশ্বের অধিবাসী হয়েও তিনি আরেকটি বাণীবিশ্ব রচনা করে যেতে পেরেছেন।

ভাষার দিক দিয়ে জীবনানন্দ প্রাকৃত বাংলার প্রাকৃত ভাষার কবি। ছন্দের দিক দিয়ে দীর্ঘ-বিলম্বিত মহাপয়ারই তাঁর কবিতার মুখ্য বাহন। শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করে নতুন অর্থ ও অর্থান্তরের অগম পারে পৌঁছবার অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই এই বিলম্বিত-পয়ার কবির নিত্য-সঙ্গী হয়েছে। অলংকারের দিক দিয়ে জীবনানন্দ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন উপমাকে। লুপ্তোপমা তাঁর রহস্যময় ধূসর জগতে পৌঁছবার একটি প্রধান চাবি। অপূর্ব অদ্ভুত উপমান সৃষ্টিতে তাঁর কলাকৃতি ক্লান্তিহীন ছিল। উপমায় উপমানের সাধারণ ধর্মকে সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখে তিনি ভাষার অর্থদ্যোতনাকে অনির্বচনীয়তার পথে অনুক্ষণ এগিয়ে দিয়েছেন। কবির বনলতা সেনের চোখ পাখির নীড়ের মতো। কোন্ সাধারণ ধর্মে পাখির নীড় চোখের উপমান হল সে-কথা কবি উহ্য রেখেছেন বলেই ভাষা অপরিসীম ব্যঞ্জনায় ভাবময় সুরময় হয়ে উঠেছে।

ভাষাশিল্পে জীবনানন্দ রাসায়নিক শিল্পী। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যেমন বিদ্যুৎস্পর্শে জলে রূপান্তরিত হয়, তেমনি কবি শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তাঁর অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়ে নব নব অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক —

> দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার ;

এখানে নরম, নদী, নারী, ফুল, কুয়াশা —এই পাঁচটি শব্দ তাদের নিজস্ব অর্থসত্তা হারিয়ে, রাসায়নিক মিশ্রণে একীভূত হয়ে, এমন একটি অর্থময়তা সৃষ্টি করেছে যা ব্যবহৃত শব্দের একটিতেও নেই। শব্দের সঙ্গে শব্দের এই যৌগিক মিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনানন্দ যে নতুন কবিভাষার জন্ম দিয়েছেন তা আমাদের উপলব্ধির জগৎকে চারুতায় ও সূক্ষ্মতায় নতুন নতুন দিগন্তে সম্প্রসারিত করেছে।

উৎস: আমার কালের কয়েকজন কবি –
জগদীশ ভট্টাচার্য

Kharagpur College
Deptt. of Bengali
Honours 4th Sem.
Study Materials
Dr. Amar Adikari
'বনলতা সেন' কাব্য

জীবনানন্দ দাশ

১

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যজগতে নতুন কবিভাষার আবিষ্কর্তা হলেন জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পাঁচভাগের চারভাগ পথ পেরিয়ে 'পূরবী' কাব্যে তাঁর ঐশী অসন্তোষকে ভাষা দিয়ে বলেছেন :

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

যে-ভাষায় কবির অন্তরের ধ্যানখানি সম্পূর্ণ বাণীমূর্তি লাভ করে সেই ভাষাই কবির নিজের ভাষা। সারা জীবন কবিকে সেই ভাষার সন্ধান করতে হয়। বহুদিনের বহুযুগের সাধনায় তাকে আয়ত্ত করতে হয়।

বস্তুত, কবিশিল্পীর শিল্পবাহন হল ভাষা। কাজেই কবির প্রথম কর্তব্য পালন করতে হবে ভাষার প্রতি। প্রথমে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা, তারপর ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি-করা এবং নতুন নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই প্রাথমিক কবিকৃত্য। কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন বিশ শতাব্দীতে নতুন ইংরেজি কবিভাষার জনয়িতা টি. এস. এলিয়ট। 'কবিতার সামাজিক কৃত্য' [The Social Function of Poetry] প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> 'We may say that the duty of the poet, as poet, is only indirectly to his people; his direct duty is to his *language*, first to preserve, and second to extend and improve. In expressing what other people feel he is also changing the feeling by making it more conscious; he is making people more aware of what they feel already, and therefore teaching them something about themselves'.

এলিয়ট তাঁর এই বক্তব্যকে বিশদীকৃত করে আবার বলেছেন,

> 'And this is what I mean by the social function of poetry in its largest sense : that it does, in proportion to its excellence and vigour, affect the speech and the sensibility of the whole nation'.

কথাটি শুধু সুন্দরই নয়, সত্যও বটে। নতুন কবিভাষার যিনি স্রষ্টা তিনি ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে জাতির অনুভূতিকেও নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত করে দেন। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে কবিভাষার নতুন রূপ ও বর্ণ সৃষ্টি করে জীবনানন্দ দাশ আমাদের অনুভূতির জগৎকে নব নব আস্বাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃত্য, এখানেই তাঁর কাব্যসাধনার পরমা সিদ্ধি।

২

জীবনানন্দ দাশ বরিশালের সন্তান। বরিশাল শহরে তাঁর জন্ম। বরিশাল শহরেই তাঁর বাল্য কৈশোর ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরে।